Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্বপার্বতী ও অরণ্যের অধিকার : তুলনামূলক দ্রোহচেতনা

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.3
Pages	৫৫-৬৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পূর্বপার্বতী ও *অরণ্যের অধিকার*: তুলনামূলক দ্রোহচেতনা

Check for updates

হোসনে আরা*

প্রমিথিউসের দেয়া আগুন নিয়ে আদিভূমিতে জীবনসংগ্রামের যে অপরাজেয় স্ফুরণ ঘটেছিল অরণ্যচারী মানবজীবনে, বহুপথ পেরিয়ে আজকের এই সভ্যজীবনে সে-সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়নি; বড়জোর ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে। একুশ শতকের সভ্যতায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মানুষ যখন বিস্ময়কর অগ্রগতির শীর্ষে অবস্থান করছে তখন এ সভ্যতার অন্তরালে অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান — যারা আদিম জীবনের ধারাকে অনুসরণ করে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতি-প্রদত্ত জীবিকা দ্বারা প্রকৃতিপূজায় আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত। আধুনিক কথাশিল্পীগণ অসীম মমতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বোধে প্রাগ্রার্য এ জনগোষ্ঠীর জীবন উপজীব্য করেছেন গল্প ও উপন্যাসে। নিস্তরঙ্গ নয়, সংগ্রামমুখর জীবনের অধিকারী যূথবদ্ধ এই মানুষেরা ঔপনিবেশিক শক্তিবিরোধী আন্দোলনে বারবার জ্বলে উঠেছে। নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করতে এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে তারা বারবার দ্রোহ চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগ্রাম-মুখর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা উপন্যাসের মধ্যে প্রফুল্ল রায়ের *পূর্বপার্বতী* (১৯৫৬) ও মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) অগ্রগণ্য।

বাংলা সাহিত্যের এ দুটি প্রণিধানযোগ্য উপন্যাসে অরণ্যচারী মানুষদের জীবন ও দ্রোহচেতনাকে উপস্থাপন করা আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

১.১

১৯৩০-এর নাগা বিদ্রোহ নিয়ে প্রফুল্ল রায় রচনা করেছেন *পূর্বপার্বতী* এবং বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৮৫-১৯০০) নিয়ে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭)। প্রাগার্য যুগের উভয় জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের স্থান ভিন্ন, উদ্দেশ্য অভিন্ন। নাগা বিদ্রোহের স্থান স্বভাবত, নাগাপাহাড় (অধুনা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'নাগাল্যান্ড') এবং মুন্ডা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ছোটনাগপুরে, বিশেষত চালকাঁড় থেকে রাঁচি পর্যন্ত মুন্ডা গ্রামগুলোতে। স্থান ও জাতিগত ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য এ বিদ্রোহদ্বয়কে একসূত্রে গেঁথেছে — উভয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে।

নাগাদের বিচিত্র বর্ণময় জীবনের শিল্পভাষ্য *পূর্বপার্বতী*কে লেখক নিজেই 'ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস'[১] বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এ উপন্যাসে ইতিহাস গৌণ, প্রকৃতিকোলে লালিত যূথবদ্ধ নাগা জাতির জীবনের রূপ-রস, নীতি-রীতি মুখ্য। লেখক তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভয়ঙ্কর অথচ অপূর্বসুন্দর নিসর্গের পটভূমিতে আদিম

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্য নাগা জাতির সমাজব্যবস্থা, জীবনচর্চা, উৎসব-প্রথা, ধর্মাচরণ, রূপকথা-উপকথা, দেব-দেবী, উৎসব-পার্বণ এবং তাদের লালসা-প্রতিহিংসা অর্থাৎ তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে উপন্যাসের মৌল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন; সঙ্গে যোগ করেছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক তথ্য এবং বাস্তব চরিত্র রানি গাইডিলিওকে[২]। ভ্রমণপিপাসু প্রফুল্ল রায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ নাগাপাহাড়ে যান। নাগাদের সংস্পর্শে, পাহাড়ি সর্দারদের কাছ থেকে তিনি তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত এবং অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করেন একনিষ্ঠ গবেষকের মতো। এ প্রসঙ্গে সর্দার এবং তথ্য-যোগানদাতা বেশ কিছু ব্যক্তির কথা লেখক কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন গ্রন্থ-ভূমিকায় —

> লামডিংয়ের শ্রীপ্রাণবল্লভ তালুকদার ও তাঁর পরিবার, ডিমাপুরের শ্রী মহাদেব কাকতি, কোহিমার শ্রীডেকা, শ্রীসেনগুপ্ত, মোককাচঙের শ্রীমথুর প্রসাদ সিংহ, মি. সেমা, মি. আও, মি.গ্রীয়ারসন এবং ইম্ফলের শ্রীথম্বাল সিং, শ্রীগিরিধারী ফুবন, শ্রীগোস্বামী ও শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বিচার সহায়তার কথা উল্লেখযোগ্য। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ২০)

উপন্যাসের শরীর গড়ে উঠেছে যুযুধান দুটি নাগা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। টিজু নদীর দুপারে ছিল একটি গ্রাম 'কুরগুলাঙ'। সময়ের প্রবাহে অখণ্ড গ্রামটি খণ্ডিত হয়ে 'সালুয়ালাঙ' ও 'কেলুরি' দুটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এ দুগ্রামের দুটি চরিত্র — সালুয়ালঙের পোকরি বংশজাত মেহেলী ও কেলুরি গ্রামের জোহরি বংশজাত সেঙাই। প্রবল প্রতিপক্ষ দুটি বংশের তরুণ-তরুণীর প্রেমের আখ্যানে যুক্ত হয়েছে ব্রিটিশদের শোষণ-পীড়ন এবং যদুনাঙও গাইডিলিওর নেতৃত্বে গান্ধিবাদী আদর্শে ইংরেজদের প্রতিহত করে নাগা-জাতীয়তাবাদের উত্তরণ। উপন্যাসের পরিণতি ট্রাজিক। মেহেলী-সেঙাই এর প্রণয় পরিণতি লাভ করেনি পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতায়। ইংরেজ প্রশাসন ও মিশনারিদের নির্মমতায় কেলুরি গ্রামে নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর মেহেলীর অধিকার ফিরে পায় ইংরেজদের অনুগত সালুয়ালাঙ গ্রাম। সেঙাই কারাবন্দি হয়ে মেহেলীর কাছ থেকে আপাতদূরে সরে এলেও এক নতুনবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং সে আশাবাদের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। উপন্যাসের মূলস্রোতটি সেঙাই-মেহেলীর প্রেম হলেও এটি প্রেমের উপাখ্যান নয়। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও ঔপনিবেশিক শাসকদের আনুপূর্বিক বিবরণে মুখর হয়েছে এ উপন্যাস। টিজু নদীর দুপারে স্থিত কেলুরি বস্তির জোহরি বংশ ও সালুয়ালাঙের পোকরি বংশ এবং তাদের বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা; তাদের সঙ্গে অন্যান্য নাগা, যেমন — আঙ্গামী, রেঙ্গমা, লোটা, আও, সেমা, কোনিয়াক, সাঙটাম প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককেও লেখক কাহিনির বুননে চমৎকারভাবে গ্রথিত করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে মুন্ডা বা আদিম জনজাতির সংগ্রামী বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। ইতিহাস-আশ্রিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুন্ডাদের সমাজবাস্তবতাই কেবল নয় তাদের স্বপ্নসাধের বিবরণকে তিনি শিল্পিত করেছেন কাব্যময় ভাষার অনুরণনে। ইতিহাস আশ্রয়ের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি —

> এই উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত 'Dust and Storm and Hanging Mist' বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হত না। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ৭৫)

অনতিদূর অতীতের মুন্ডা-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক দলিল যথেষ্ট দুর্লভ নয়[৩]। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তো বটেই ,একটি জাতিসত্তার উত্থানেও এ বিদ্রোহ ইতিহাসে গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য ও মুন্ডাদের সংগ্রামী জীবন ও চেতনার সংযোগে রচিত *অরণ্যের অধিকারের* মূল কাহিনি বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে উলগুলান বা মহাবিদ্রোহ (১৮৯৯)। ব্রিটিশ রাজ এবং দেশীয় জমিদার মহাজন-পুলিশ ঠিকাদারদের শোষণ-পীড়নের শিকার মুন্ডাদের এ বিদ্রোহ কেবল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে নয়, বরং সকল শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধেও। উপন্যাসের নায়ক বীরসা কেবল মুন্ডা জাতির জন্য নয়, অরণ্যের সমস্ত আদিবাসীর (সাঁওতাল, ওরাওঁ-কোল- হো প্রভৃতি) মুক্তির জন্য অরণ্যের অধিকার দাবি করেন। তাই তার ডাকা আন্দোলনের নাম 'উল্‌গুলান' বা মহাবিদ্রোহ। লেখক সাঁওতালদের গণবিদ্রোহ 'হুল' এবং মুন্ডা সর্দারদের স্বার্থ সিদ্ধির লড়াই 'মুলুক-ই লড়াই'-এর চেয়েও উলগুলানকে মহিমান্বিত করেছেন। কেননা বীরসার লড়াই সকল উপজাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদার। বীরসা তাই মুন্ডাদের ভগবান। লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে সে গ্রহণ করেছে এক নতুন অস্ত্র — ধর্মের নবউত্থান। তার এ বিদ্রোহ ধর্মীয় লড়াই হিসেবে ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে। অসম এ লড়াইয়ে তার সাময়িক পরাজয় ঘটেছে, শাসকদের পরিকল্পিত পরিকল্পনায় মৃত্যু হয়েছে তার কিন্তু এক অনির্বাণ প্রত্যাবর্তনের সুস্পষ্ট ঘোষণায় মুন্ডাদের মনোজগত আলোড়িত হবার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে — যা পরবর্তীকালে *চোট্টিমুণ্ডা ও তাঁর তীর* (১৯৮০) নামক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিস্তৃত করেছেন।

২.১

বাংলা সাহিত্যের বৃত্তে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মুন্ডা শাখার (সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, ভূমিজ, বিরহড়, হো, কিসান প্রভৃতি) জনগোষ্ঠী নিয়ে সর্বাধিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। এর পর বেশি রচিত হয়েছে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত (ওরাওঁ, মালপাহাড়িয়া, শাওরিয়া, পাহাড়িয়া, গোণ্ড, খোণ্ড প্রভৃতি) আদি জনগোষ্ঠী নিয়ে। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত সকলে এ বৃত্তভুক্ত। তাই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী নাগাদের নিয়ে রচিত একমাত্র বাংলা উপন্যাস প্রফুল্ল রায়ের *পূর্বপার্বতী* বিষয়গত দিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। ভারত সীমান্তের নাগাভূমিতে নাগাদের বাস। সুউচ্চ পাহাড়, গহীন অরণ্য, ভয়াল গিরিখাত, বিস্তৃত উপত্যকা, নদী-জলপ্রপাত-ঝরনার সমাবেশে শ্বাপদসঙ্কুল এ জনপদের জনজীবন ও মানসে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দরের মিশ্রিত প্রভাব লক্ষণীয়। প্রকৃতির শান্ত নয়, ভয়ালরূপে আকৃষ্ট এ জনপদ। তাদের কল্পলোকে প্রকৃতির ক্রূরতা ও ভয়ঙ্কর রূপটি তাদের পূজ্যদেবীর আদলে আভাসিত হয়। সে কারণে তাদের বনদেবী 'আনিজা' অসম্ভব নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মূর্তিতে তাদের মানসলোকে আবর্তিত। সর্বদা সচেষ্ট থাকে তারা, যেন কোনো অনিয়ম কিংবা অনাচারের ফাঁক চুইয়ে 'আনিজা'র কোপদৃষ্টি না

পড়ে, কেননা এ বনদেবীর কাছে অনিয়ম অশুচিতার অর্থই হল মৃত্যু বা অকল্যাণ। উপন্যাসে আদিজনগোষ্ঠীর এ ধরনের ভীতির সবিশেষ পরিচয় রয়েছে। শিকারের পূর্বরাতে রেঙকিলান পবিত্র গৃহ 'মোরাঙ'-এ না থেকে স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হয়েছে এবং 'জঙগুপি' কাপড় নিয়েই সেঙাইয়ের সঙ্গে শিকারে এসেছে। উপর্যুপরি কয়েকবার পশু শিকারে ব্যর্থ হয়ে রেঙকিলানের বিশ্বাস দৃঢ়তায় পরিণত হয়, সে নিশ্চিত হয় আনিজার অভিশাপ লেগেছে তার। তীব্র আতঙ্কিত রেঙকিলানকে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> শুধু তার স্নায়ুর তারে তারে এক তীব্র আতঙ্ক তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে আনিজা! আনিজা! দূর পাহাড়চূড়া থেকে বনদেবীর অভিশাপ তাকে লক্ষ করে যেন উদ্যত হয়ে রয়েছে। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ৩৯)

শুধু তাই নয়, ভীত সন্ত্রস্ত রেঙকিলানের অপমৃত্যু এ ধারণা সকলের মনে দৃঢ় করে যে, আনিজার কোপ থেকে কারও রেহাই নেই।

অরণ্যের অধিকার-এ প্রকৃতি ভীতিকর নয়, বরং পরম স্বস্তিদায়ক মাতৃমূর্তিতে অভিষিক্ত। মুন্ডাদের কাছে অরণ্য হল মা; যে কি-না গভীর মমতায় অপার স্নেহে অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর মুখে অফুরন্ত খাবার জুগিয়ে, শান্ত নিবিড় আশ্রয়ে সর্বদা আগলে রাখে। পুরুষানুক্রমে তাদের চেতনায় প্রকৃতিকে মা বলে আবাহনের ইঙ্গিত উপন্যাসের সমগ্রতায় ছড়িয়ে আছে। কিছু উদ্ধৃতির আলোকে মুন্ডা চেতনার স্বরূপ প্রকটিত করা যেতে পারে—

> ক. যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমাচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে মা বলে জানে। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১২০)

অন্যত্র রয়েছে —

> খ. জঙ্গল তো সকল মুন্ডার মা! কিন্তু বীরসা বুঝতে পারছিল ওর অরণ্যজননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে আইনের হাতে বন্দিনি। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ :১২২)

অরণ্যকে 'মা' বলে মেনেছে বলে অরণ্যের কান্না যেন শুনতে পায় আরণ্যক-পুত্র বীরসা। বন কেটে উজার করে প্রকৃতি-শত্রু মানুষেরা যেন বনের সম্ভ্রমহানি ঘটাচ্ছে। যে বনাঞ্চল ছিল কেবল আরণ্যক মানুষের একান্ত আপন ভুবন — সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে অর্থলোভী দিকুদের। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বীরসা অরণ্যকে 'মা' সম্বোধন করে এ অনাচারের প্রতিকার বিধানের প্রতিশ্রুতি দেয়—

> দিব, দিব তোমারে শুদ্ধ করে, হা তুমি মোর মা বট, সকল মুণ্ডার মা বট তুমি, তোমা হতে ঘরের চাল, ঘরের দেওয়াল, ক্ষুধায় কন্দ-ফল, মূল-খরাবরা-শজারু-হরিণ-পাখির মাংস মা গো! (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১২২)

কৃষিপ্রধান সমতলে মাটিকে আমরা মা বলে জানি এবং মানি — কেননা মাটির বুক চিরে জেগে ওঠা শস্যে যাপিত হয় সমতল-ভূমির মানুষের জীবন। তেমনি অরণ্যের কোলে লালিত এবং অরণ্য দ্বারা পুষ্ট জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে অরণ্যকে মা বলে জানবে, মানবে — সেটি সহজাত। এখানে কৃষিজীবী সভ্যতার মানসিকতার প্রভাবে আরণ্যক জীবনকে, তাদের মননকে চিত্রিত করা হয়েছে।

২.২

যে-কোনো জাতির রক্তে মিশে থাকে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় সৃষ্ট পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি। *পূর্বপার্বতী* উপন্যাসে নাগাজাতির সামগ্রিক জীবনকে অনুপুঙ্খতায় ধারণ করা হয়েছে। এ উপন্যাসে নাগাজীবনে সূর্যোদয় ও সূর্যের অস্তাচলে যাওয়ার পুরাণ-গল্প প্রচলিত। বৃদ্ধা বেঙসানুর মুখে এ গল্প শুনে নাগা-যুবক সারুয়ামারু তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মিশনারিদের সংস্পর্শে শহুরে জীবনের ছোঁয়ায় সারুয়ামারু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অর্থাৎ দিবা-রাত্রির প্রকৃত রহস্য জেনে যায়। সে কারণে বেঙসানুর পুরাণ-গল্পকে উড়িয়ে দিয়ে সে উচ্চারণ করে— 'দূর, সাহেবরা তো অন্য কথা বলে।' (প্রফুল্ল, ২০০২ : ৫০) দীর্ঘ-লালিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারণ করায় ভীত-সন্ত্রস্ত বৃদ্ধা বেঙসানু সারুয়ামারুর বিরুদ্ধে সূর্যদেবতার অবমাননার অভিযোগ তোলে এবং সিংহভাগ জনতা তার পক্ষাবলম্বন করে গ্রামের অমঙ্গল নাশ করতে সূর্যের উদ্দেশে মুরগি বলি দেয় এবং সারুয়ামারুকে খারে বর্শায় বিদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। লক্ষণীয় যে, সারুয়ামারু ও তার স্ত্রী জামাতসুও মুরগি বলি দেয়। অর্থাৎ একদিকে তারা সূর্য-দেবতাকে নিয়ে পৌরাণিক গল্প অবিশ্বাস করে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে কিন্তু সূর্যকে দেবতা হিসেবে একেবারে খারিজ করে দেয় না। সকলের সঙ্গে তারাও সূর্য দেবতার উদ্দেশে বলি দেয়। এ কাহিনি একদিকে যেমন সংস্কারাচ্ছন্ন নাগাদের বিশ্বাসের রূপটি তুলে ধরে অন্যদিকে পরিবর্তনের ইঙ্গিতও ধারণ করে। নতুনকে পুরোপুরি গ্রহণ এবং পুরনোকে সম্পূর্ণ বর্জন করা তাদের সাধ্যাতীত; এ দু'য়ের দোলাচলে তারা আবদ্ধ থাকে। তবে তাদের এ দ্বন্দ্ব ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের বীজকে ধারণ করে এবং উপন্যাসের শেষাংশে সেঙাইয়ের মধ্য দিয়ে সে পরিবর্তন সূচিত হয়।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে অবশ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাস্রোতে সংস্কার বা আচার পালন নয় বরং প্রথাভঙ্গের দৃঢ়তাই লক্ষণীয়। বীরসা ভগবান হয়ে মুন্ডাদের মুক্তির আহ্বান নিয়ে আসে। এ মুক্তি সংস্কারের নাগপাশ থেকে, এ মুক্তি জড়ত্ব থেকে প্রাণের প্রতিষ্ঠায়। বোঙা-বুঙ্গির পূজা, করমপুজা, বলিদান, হাঁড়িয়া পান, নাচ — সবকিছু তুলে দিয়ে বীরসা পুরাকালের মুন্ডা ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চায়; মুন্ডারীরাজ প্রতিষ্ঠায় সে সংকল্পবদ্ধ। প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে সে আজকের পৃথিবীতে, আধুনিক সময়ের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে চায় মুন্ডাদের; কিন্তু এ 'আধুনিক সময়ে' পৌঁছে মুন্ডারা যেন তাদের আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ, সাম্যনীতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানবধর্মে যেন তারা আশ্রয় পায়— সেটা নিশ্চিত করতে বীরসা নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করেছে তার বিশ্বাসী বা অনুগতদের। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> বড়ো প্রাচীন মুণ্ডারক্ত। যেদিন ভারতে শ্বেতজাতি ঢোকে নি, সেই কৃষ্ণ ভারতের সন্তান মুণ্ডারা। বীরসা এক দুঃসাধ্য ব্রত নিয়েছে। যেন নদীর উৎসে ফিরে যেতে চাইছে ও। বহিরাগতদের কাছ থেকে নেওয়া 'করম পূজা' ও অন্যান্য রীতিনীতি, প্রাচীন অসার জাদু-রীতিনীতির বোঝা বুকে চেপে থাকলে মুণ্ডারা মাথা তুলতে পারবে না। তাই এক সহজ, সুন্দর, নির্ভার ধর্ম চাই। তাই বীরসা ভগবান হয়ে ধর্মে বিপ্লব এনেছে। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১৮৩)

মুন্ডাদের রাজত্ব কায়েম করতে হলে 'বিপ্লবের' কোনো বিকল্প নেই। ধর্মীয় বিপ্লব মানে ধর্মের পুরনো খোল-নলচে — যা চলার পথে কেবল বিঘ্ন ঘটায়, বহুপ্রাচীন সংস্কার — যা রক্তে আদিম দোলা নয়, বরং নিস্পৃহতা জাগায়; সেগুলো পরিত্যাগ করা, একেবারে ঝেড়ে ফেলা। পুরনোর বিসর্জন এবং নতুনের আবাহনের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত বীরসা মুন্ডাদের মধ্যকার ঐক্যকে জাগিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে চেয়েছে স্বজাতির জন্য।

২.৩

পূর্বপার্বতী ও *অরণ্যের অধিকার* দুটো উপন্যাসের পটভূমি ঐতিহাসিক। নাগা বিদ্রোহের পটভূমিতে *পূর্বপার্বতী* রচিত হলেও রানি গাইডিলিও ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাস্রোতে সম্পৃক্ত হয়নি — যদিও এ চরিত্রের সূত্রে গান্ধীজি এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত সমসাময়িক বেশ কিছু ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গাইডিলিওর প্রতি লিকোক্যুঙবা নামক এক যুবকের জবানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

> আমি নিজে গান্ধীজির বক্তৃতা শুনেছি। ব্রিটিশরা ভারত না ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। শুধু কলকাতায় নয়, বোম্বাই, পাঞ্জাব, গুজরাট — সমস্ত ভারতবর্ষ একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ১৫৪)

ডিমাপুর বাজারের ব্যবসায়ী গান্ধী-ভক্ত মাধোলালও গান্ধীজির লড়াইয়ের খবরে উদ্বুদ্ধ করে সেঙাইকে এবং পরবর্তী সময়ে শিলং কারাগারে বন্দি থাকার সময় বসন্ত সেন নামক এক স্বাধীনতাকামী আদিম সেঙাইয়ের মধ্যে আধুনিক দেশকাল সম্পর্কিত শিক্ষাদানের গুরুভার গ্রহণ করে। আদিম মানুষের উগ্র প্রবণতাগুলোর স্থানে বেদনা ও মমতার মতো সুকুমারবৃত্তির স্ফুরণ ঘটিয়ে বসন্ত নতুন এক চেতনায় দীক্ষিত করছে সেঙাইকে। উপন্যাসের সমাপ্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

> সেঙাই-এর মনে বেদনা ও মমতার জন্ম হল। সেঙাই-এর আদিম জীবন শেষ হল। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ২৬২)

প্রকৃতপক্ষে আদিম অরণ্যচারী জীবনের আধুনিকায়ন নয়, ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য এ মানুষদের ভারতীয় করে জাতীয় সংগ্রামে শক্তির উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনকে সীমাবদ্ধ না রেখে 'অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানের মিলন ঘটলে এই সব আদিম মানুষ দেশকে নতুন শক্তি দেবে' — এ ভাবনায় সেঙাই-এর চারিত্রিক বিবর্তনকে আকাঙ্ক্ষা করেছেন ঔপন্যাসিক। এ ধরনের পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধনে সেঙাইয়ের জাতি বা গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য কতখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে তা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং ঔপন্যাসিকের মনোভাব নিয়েও খানিকটা বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। যদিও উপন্যাসের সম্পূর্ণ পরিধির মধ্যে আদিম জীবন ও জাতিসত্তা নিয়ে কোনো নেতিবাচকতা নেই; অসভ্য, হিংস্র আদিম রীতি-নীতির বর্ণনা কৌতূহল বা ঔৎসুক্যে পাঠকের মনকে নাড়া দেয় — বিবমিষার বা ঘৃণার সৃষ্টি করে না। এ পরিবর্তনকে যদি আমরা অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের পথে যাত্রা বলে গ্রহণ করি তাহলেই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর মেলে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় —

> বসন্ত ভাবলেন, আসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল, বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ। কোটি কোটি মানুষের এই দেশের আত্মা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলছে। সমতলের শহর-বন্দরের সুসভ্য মানুষই কেবল নয়, অরণ্যচারী এবং পাহাড়ী আদিবাসীরাও নতুন স্বপ্নে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, শুধুমাত্র অফুরন্ত প্রাণাবেগ এবং উন্মাদনা সম্বল করে স্বাধীনতার লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ২৬০)

ইতিহাস থেকে আমরা জানি, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যদোনাঙ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ২৯ আগস্ট ১৯৩১-এ ইম্ফল জেলে ইংরেজরা তাকে ফাঁসি দেয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে রানি গাইডিলিও যদোনাঙের সংস্পর্শে এসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ সালে কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাইডিলিও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছেন — পাহাড়ি, অরণ্যচারী নাগাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন এবং 'রানি' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। গাইডিলিও চরিত্রের উল্লেখে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন নয়তো উপন্যাসের শেষাংশ ছাড়া ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনাবলি কিংবা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসের সূচনাংশে পাওয়া যায় না। সেঙাই-মেহেলী উপাখ্যান রচনায় ঔপন্যাসিক যতখানি আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত; ইতিহাস প্রসঙ্গে ততখানি নয়। কাহিনিসূত্রে কিংবা কাহিনির পরিণতি নির্মাণে ইতিহাস উপাদান হিসেবে এসেছে, মূল ঘটনা হিসেবে নয়। তবে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ভারাক্রান্ত হয়ে উপন্যাসের কোথাও কোথাও শিল্পগুণ বিনষ্ট হয়েছে। গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি লেখকের আস্থা, সমর্থন উপন্যাসে বহুলাংশে বিস্তৃতি পেয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি অনাস্থা এবং তার বিপরীতে অহিংস আন্দোলনের স্তাবকতা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মতাদর্শের দ্বান্দ্বিকতাকে স্পষ্ট করেছে। বসন্ত সেনের প্রসঙ্গেই লেখক তাঁর মতটি স্পষ্ট করেছেন এভাবে —

> বছর তিনেক আগের কথা। সন্ত্রাসবাদে তখন অসীম আস্থা বসন্তর। সে সময় তাঁর ধারণা, রক্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ২৫৮)
>
> এমন করে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী মনটা একদিন মরে গেল। নতুন ভাবনার পুঞ্জ পুঞ্জ আলো এসে পড়ল তাঁর চিন্তায়। মেলডাকাতি, দু-একটা খুনখারাবি কিংবা খণ্ড খণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশের এবং দেশের মানুষের কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভীতি এবং আতঙ্ক। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় সন্ত্রাসবাদীকে। আত্মগোপন করে থাকতে হয়। নিজের অজান্তেই বোমা-পিস্তলের রোমান্সের সঙ্গে মনের মধ্যে অপরাধবোধ লুকিয়ে থাকে।
>
> দ্বিধায় যখন মন দুলছিল তখন পায়ের সামনে আরেকটা পথ পাওয়া গেল। সে পথ অহিংস সত্যাগ্রহের। অসহযোগের।
>
> এ পথে অপরাধীর মতো লুকিয়ে চুরিয়ে বেড়াতে হয় না। সগৌরবে মাথা উঁচু করে চলা যায়। সত্যাগ্রহের দীক্ষা নিয়ে নতুন জন্মলাভ হয়েছিল বসন্তর। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ২৫৮)

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি মুণ্ডা বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী মুন্ডা বিদ্রোহের উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য, প্রস্তুতিপর্ব, ঘটনা, পরিণতি সমস্তই কাহিনিসূত্রে সরলরৈখিকভাবে সাজিয়েছেন। অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা-ক্ষোভ, আশা-নিরাশা, রীতি-

নীতি, জীবনাচার এ বিদ্রোহের সূত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়েছে। বীরসার বিদ্রোহের কারণ, এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং চরিত্র এ উপন্যাসে বাস্তবতার ভিত্তি পেয়েছে। রাঁচীর ডি.সি. স্ট্রিট ফিল্ড, পুলিশ-সুপার মীআর্স, সিংভূমের ডি.সি.ডব্লু.বি. টমসন, ব্যারিস্টার জেকব, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জে. এ. প্ল্যাটেল এবং সর্দাররাসহ নেতৃত্বাধীন বেশিরভাগ চরিত্র ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। উপন্যাসের স্থান-কাল সমস্তই ইতিহাস-অনুসৃত। উলগুলান, সৈলরাকাবে গণহত্যা, 'দি স্টেটসম্যান' ও 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকায় প্রকাশিত খবর — প্রতিটি ইতিহাস সমর্থিত। এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে লেখক উপন্যাসের ভূমিকাতেই জানিয়ে দেন —

> ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনীতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুণ্ডা ও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।
> লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসা-কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ :৭৫)

এ অঙ্গীকারের প্রমাণ উপন্যাসের সমগ্র অবয়বে সূচিত। উপন্যাসের শুরুতেই স্থান-কাল উৎকীর্ণ — '৯ই জুন ১৯০০। রাঁচি জেল' বীরসার মৃত্যু দিয়ে উপন্যাসের শুরু ও সমাপ্তি আর সমগ্র উপন্যাসজুড়ে বীরসার ভগবান হয়ে ওঠা এবং প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার কাহিনি মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। মুন্ডাজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ঔপন্যাসিক কাব্যময় অথচ বিপ্লবের বর্ণনায় নিখুঁত ইতিহাস-অনুসারী। এমনকি পাদটীকা ব্যবহার করেও মহাশ্বেতা ঐতিহাসিক সত্যকে দাখিল করেছেন। বীরসার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের রিপোর্টের সঙ্গে তৎকালীন পুলিশ-সুপার মী-আর্স সংযোজন করেন ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ তারিখ ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে 'অ্যাডজুডেন্ট জেনারেল ইন ইন্ডিয়া হোম ডিপার্টমেন্ট'কে পাঠানো ঐতিহাসিক 'ডেসপ্যাচ' যা ঔপন্যাসিক পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন — 'টেলিগ্রাম নং ৩৫০ তারিখ-১৯/১২/১৮৯৯ প্রোগ্রেস নং ৩২৬। দ্রষ্টব্য হোম ডিপার্টমেন্ট, মেমো নং ৪৫৩-ক্যাম্প। তারিখ-৩০/১২/১৮৯৯। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১৯৪)

এতকেদিতে গয়া মুন্ডার কনস্টেবল হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার ঘরে নারী ও শিশুদের উপর ডি.সি. ও কমিশনার ফর্বসের নির্বিচারে গুলি চালানোর ঘটনার বিবরণও পাদটীকায় উল্লেখিত—

> কমিশনারের উদ্দেশে ডি.সি. স্ট্রিটফিল্ড/তাং বন্দ গাঁও/৭/১/১৯০০/পত্রসহ — পত্র নং ওয়ান-টি-বি তাং ক্যাম্প সাইকো /১০/১/১৯০০/ এ ফর্বস-এর নিকট হইতে সি.এস.গভরমেন্ট অফ বেঙ্গলের উদ্দেশ্যে। প্রোগ্রেস নং/৩৩৫/আগস্ট ১৯০০/হোম ডিপার্টমেন্ট/এন-এ-ওয়ান। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১৯৯)

বাস্তবিক, ১৯০০-এর ৬ জানুয়ারি থেকে মুন্ডাদের সংগ্রাম শুরু হয়। মূল লড়াই শুরু হয় ৭ জানুয়ারি ১৯০০, খুনটি থানা আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ১৫০০ জন সৈন্য ও ১০০ জন সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে নিয়ে পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। মুন্ডারা লড়াই করে এ সৈন্যদের বিরুদ্ধে — যদিও জনবল ও অস্ত্রবলে দুর্বল হওয়ায় তাদের পশ্চাৎপদ হতে হয় এবং ১০ জানুয়ারি সৈলরাকাবে ভয়াবহ সংঘর্ষের পর বহু সংখ্যক মুন্ডার নিহত ও আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের আপাত সমাপ্তি ঘটে। বীরসার মৃত্যু পর্যন্ত এ বিদ্রোহের জের বজায় থাকে।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শুরুতে জানিয়েছেন — '৯ই জুন ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল।' (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ৭৭) এ দিন সকাল আটটায় বীরসার রক্তবমি শুরু ও মৃত্যু সকাল সাড়ে নয়টায়। ডেপুটি জেল সুপার অমূল্যবাবু একটি কাগজে লেখে, 'বীরসা মুণ্ডা প্রথম অসুস্থ হয় ২০-৫-১৯০০ তারিখে।' (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ৮২) *মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক* গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় বীরসার মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন —

> বিচার শেষ হইবার পূর্বেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে রাঁচি জেলে কলেরা রোগে এই ঐতিহাসিক মুণ্ডা বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বীরসা ভগবান মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (সুপ্রকাশ, ২০০১ : ১০৩)

বীরসার জীবনকাহিনি, বিদ্রোহের বিবরণ, ঐতিহাসিক তথ্যাদি গবেষণালব্ধ হলেও জন্মমৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে অনুমান করা যায়। তা হলেও এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি নড়বড়ে নয় বরং যথেষ্ট পোক্ত।

২.৪

ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মম হত্যাযজ্ঞের বিবরণ *পূর্বপার্বতী* ও *অরণ্যের অধিকার* উভয় উপন্যাসেই কাহিনি-সূত্রে গ্রথিত। গণহত্যা, শঠতা, শিশু, নারী, বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা — আধুনিক মারণাস্ত্রের বিপরীতে তীর-ধনুক-বলোয়া-বর্শার ঝলসে ওঠা; অসীম সাহসিকতায় বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দ্রোহের শিখা প্রদীপ্ত করা — এসবেরই ইতিবৃত্তে উভয় উপন্যাসের মূল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। *পূর্বপার্বতীতে* কেলুরি বস্তিতে পুলিশ সুপার বসওয়েল ও পাদ্রি ম্যাকেঞ্জির নির্দেশে যে গণহত্যা ঘটে তার ঐতিহাসিক কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই তবে রানি গাইডিলিওকে গ্রেপ্তারের জন্য ১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ পুলিশ-বাহিনী যে গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়েছে এবং ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে, সে-ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে।

কেলুরি গ্রামের গণহত্যার ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও আদিম জনগোষ্ঠীর আদিম হাতিয়ারের বিপরীতে আধুনিক মারণাস্ত্রের তীব্র ধ্বংসলীলা, নারী-পুরুষ-বৃদ্ধা নির্বিচারে হত্যা ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হিংস্রতা ও নির্মমতাকে স্পষ্ট করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ গণহত্যার পটভূমিতে পুলিশ সুপার বসওয়েলকে স্থাপন করা হয়েছে। বসওয়েল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত ক্যাপ্টেন। বিশ্বযুদ্ধের অজস্র রক্তপাতেও তার মনে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়নি, কোন করুণা বা মমতার চিহ্ন নেই তার চরিত্রে, বরং তার দম্ভোক্তিতে অনাগত রক্তপাতের ইঙ্গিত স্পষ্ট —

> ম্যাসাকার, ডেস্ট্রাকশন, আউটরেজ — এগুলোর মধ্যে আমি আনন্দ পাই, আমার স্পোর্টিং স্পিরিটকে খুঁজে পাই। (প্রফুল্ল, ২০০২ : ১৩৩)

মূলত এ ব্যক্তির অতীতের স্মৃতিচারণে তার নৃশংসতার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রকৃতই ইংল্যান্ডের কুখ্যাতদের উপনিবেশগুলোতে প্রেরণ ইতিহাস-সমর্থিত। ইতিহাসের সে-উপাদানকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে লেখক *পূর্বপার্বতীর* গণহত্যার এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ নির্মাণ করেছেন।

ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার বিবরণ রয়েছে *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসেও। সৈলরাকাব পাহাড় ও তার চারদিকের জিউরার জঙ্গলে ১৮৯৯-এর ২৫ ডিসেম্বর থেকে হাজার হাজার মুন্ডা সমবেত হয় কুচিলা তীর নিয়ে। তারা জানত কুচিলা তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা মারাত্মক। তবুও তারা সুসজ্জিত ইংরেজ পুলিশবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ায়, আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায় এবং দ্রোহের বাণীতে নিজেদের উজ্জীবিত করে —

> রাজটা কাদের? সাহেবদের? মোদের রাজ? মোরা তাদের দেশে গিয়াছি রাজ করতে, না তারা এসাছে হেথা? তবে হাতিয়ারটা কে দেবে? মোরা? সাহেবরা হাতিয়ার নামায়ে রেখে চলা যাও। মোরা হাতিয়ার দিব বলে হেথা এসেছি? রাজ নিব বলে এসাছি। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ২০৫)

কমিশনার ফর্বস, রোশ ও স্ট্রিটফিল্ডের নির্দেশে গুলি করা হয় মুন্ডা পুরুষ, বালক, এমনকি সন্তান কোলে মুন্ডা নারীর ওপরও। ১৯০০-এর ২৫ মার্চ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ — অন্তত চারশো মুন্ডা গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। 'বেঙ্গল পুলিশ ইনটেলিজেন্স'-এ প্রকাশ যে এই যুদ্ধে মুন্ডাসর্দারদের মধ্যে সাতশো মুন্ডার প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। যদিও মিশনারি হফম্যানের মতে কুড়িজন ও সরকারের বিবৃতিতে — সৈলরাকাবে দশজন মুন্ডা নিহত ও আহত সাত। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কিংবা নানা বিবৃতির মধ্যে আহত ও নিহতের সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও মুন্ডাদের দ্রোহ যে স্বাধিকার আদায়ের দ্রোহ তা স্পষ্ট। তাই বীরসার এ লড়াই ইতিহাসে অনন্য, ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের মাইলফলক।

২.৫

মিশন ও মিশনারিদের দুষ্ট প্রভাব *পূর্বপার্বতী* ও *অরণ্যের অধিকার* উভয় উপন্যাসেই সমভাবে লক্ষিত। বস্তুত, শাসনযন্ত্রের সঙ্গে ধর্মের একসূত্রিতা — ঔপনিবেশিক শক্তির অন্যতম হাতিয়ার। *পূর্বপার্বতী* উপন্যাসে ব্রেটনব্রুকশায়ারের দুর্দান্ত আউট'ল এবং বর্তমান পাদ্রি ম্যাকেঞ্জির উক্তিতে তা স্পষ্ট —

> ব্রিটিশ রাইফেল যেখানে গেছে সেখানেই বাইবেল গিয়ে হাজির হয়েছে। রাইফেল-বাইবেলে মিলন না হলে পৃথিবীজোড়া রাজ্য করা সম্ভব হত আমাদের? (প্রফুল্ল, ২০০২ : ১৩২)

পাদ্রি ম্যাকেঞ্জি ও পুলিশ সুপার বসওয়েলের যৌথ পরিকল্পনায় রানি গাইডিলিও গ্রেপ্তার-অভিযান এবং এ দেশীয় মানুষদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়। অবশ্য পিয়ার্সন

নামক একজন সৎ, ধার্মিক, পরোপকারী পাদ্রি চরিত্রও নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও শেষাবধি সে পাগল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসেও ব্রিটিশরাজ টেকাতে এবং দেশীয়দের দমিয়ে রাখতে মিশনারি ও চার্চের কার্যকর ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে। কেবল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, ক্ষমতার পালাবদলে তারাও নির্ধারক; বীরসা তাই অকপটে বলে —

> সাহেব সাহেব এক টোপি, সরকার যা, মিশন তা, সব এক সমান। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১১৬)

সর্দারদের লড়াইয়ে ফাদার নট্রটের ভূমিকা, মুন্ডা-বিদ্রোহের সম্পর্কে ফাদার হফম্যানের রিপোর্ট — এ সমস্ত কিছু ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনযন্ত্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রচারকদের সহাবস্থানকে নিশ্চিত করে।

১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে যখন তামার থানার কনস্টেবলরা বীরসাকে গ্রেফতার করতে যায় তখন দুশো মুন্ডাকে নিয়ে তাদের সহায়তা করতে আসে পলুস প্রচারক। এভাবে ধর্মপ্রচারকরা মুন্ডাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে মুন্ডাদেরই ব্যবহার করেছে এবং সহায়তা করেছে প্রশাসনকে। এরপর রাঁচির পুলিশের ডেপুটি সুপার মীআর্স যখন বীরসাকে গ্রেফতার করতে আসে, তখনও তার সঙ্গে এসেছে মুরহু মিশনের রেভারেন্ড লাসটি।

পূর্বপার্বতীর মতো এ উপন্যাসেও মুন্ডাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন ধর্মযাজক এসেছেন। ক্যাথলিক মিশনের ফাদার লীয়েভেনস্ স্পষ্ট বলেছিলেন,

> যারা অত্যাচারী, তাদের সঙ্গে লড় গিয়ে। লড়লে পরে ওরা ঠাণ্ডা হবে। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ১১২)

সরকার অবশ্য ফাদার লীয়েভেনসকে বদলি করে দেয়।

নেতিবাচক চরিত্রের পাশাপাশি দুই ইতিবাচক চরিত্র ফাদার পিয়ার্সন ও ফাদার লীয়েভেনস উভয় উপন্যাসে সাযুজ্য এনে দিয়েছে। বস্তুত ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে পাঠককে এ বার্তা দিতে চাচ্ছেন যে, ধর্ম বা ধার্মিকরা শোষকের ভূমিকা কখনও নেয় নি বরং শোষকরাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মকে হাতিয়ার করেছে। সুতরাং খ্রিষ্টধর্ম প্রচার এবং তাদের প্রচারকেরা মুখ্য কিংবা নেতিবাচক নয় — ঔপনিবেশিকদের ঘৃণ্য ভূমিকাকে স্পষ্ট করা ঔপন্যাসিকদের অভীষ্ট। সে-কারণে উভয় উপন্যাসে ধর্মকে ব্যবহারের প্রকৃতচিত্রের পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মযাজক — যারা মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী — তাদের চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে ফাদার পিয়ার্সন ও ফাদার লীয়েভেনস্-এর মাধ্যমে। ফাদার পিয়ার্সন কল্পিত হলেও ফাদার লীয়েভেনস্-এর অস্তিত্ব ছিল — ইতিহাস তাতে সাক্ষ্য দেয়।

২.৬

আদিবাসী বিদ্রোহগুলো সংঘটিত হয়েছে ভূমিকে কেন্দ্র করে। অবশ্য *পূর্বপার্বতীর* প্রেক্ষাপট ভিন্ন; সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত প্রতিরোধে সামষ্টিক সংগ্রামের সঙ্গে

একাত্ম হয়ে তারা বিদ্রোহ করেছে । যদিও মূল সংগ্রাম বা তাদের পরবর্তী সংগ্রামের কেন্দ্রে ভূমিই অবস্থান করেছে। নাগাল্যান্ডের স্বাধিকার আন্দোলনের মানে ভূমির অধিকার আন্দোলন — *পূর্বপার্বতীর বিষয়* অবয়বে সে আন্দোলনের উল্লেখ কম হলেও তাৎপর্যহীন নয়। মূল ঘটনার সমান্তরালে রানি গাইডিলিওর আগমনের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপন্যাসে রয়েছে সেখানেও ভূমির গুরুত্ব রয়েছে। রানি গাইডিলিও যদোনাঙ-এর সহযোগী বা সহযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। যদোনাঙ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ ঔপনিবেশিকতার পাশাপাশি নাগাদের জাতীয় আন্দোলনের বিষয়কেও স্পষ্ট করে তুলেছে। উল্লেখ্য যে, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত নাগারা প্রাচীন জাতি হিসেবে বার্মা, ভারত ও চিনে তাদের বসতকেন্দ্র গড়ে তোলে। ১৮৩৭-১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা নাগারাজ্যে বহুবার ফৌজি অভিযান চালায় এবং নানা চুক্তিতে আসতে চায়। কিন্তু তারা দীর্ঘকাল নানা কৌশল প্রয়োগ করেও নাগাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম ছিল না। পরবর্তী সময়ে নাগারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও দীর্ঘকাল লড়াই করেছে।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে মুন্ডাদের বিদ্রোহের কেন্দ্রই হল ভূমি। মুন্ডা-ইতিহাস ঘাঁটলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকদের মতে, ছোটনাগপুর (ঝাড়খণ্ড) প্রদেশের জঙ্গল কেটে মুন্ডারাই প্রথম সেখানে বসতি গড়ে তোলে এবং একসময় তারা ওই প্রদেশের ভূস্বামী ছিল। কর্নেল ডালটন প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, ছোটনাগপুরের বর্তমান নাগাবংশীয় রাজারাও কোল-বংশোদ্ভূত। ছোটনাগপুরের মুন্ডা, ওরাওঁ ও খড়িয়া তিনজাতি 'কোল' নামে অভিহিত। এই তিন জাতির মধ্যে মুন্ডা জাতির প্রাধান্য সর্ববাদীসম্মত — তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে পুরাতন মগধরাজ্য অতিক্রম করে ছোটনাগপুরে প্রবেশ করে এবং এ ভূখণ্ডকে বসবাস উপযোগী করে তোলে। (শরৎচন্দ্র, ২০০৫ : ৯২)

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে এ ইতিহাসকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে বীরসা বিদ্রোহের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। ঔপন্যাসিক এ ইতিহাসের পটভূমিতে মুন্ডা সমাজের বঞ্চনার ইতিহাসের গাথা রচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্মৃতিগাঁথার উপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে —

> আমি সুগানা মুণ্ডাটা, আমার মনে থাকে না কবে আমার পূর্বপুরুষ চুটু আর নাগু এসে আচোটা জমিতে চোট মেরে, কুমারী অরণ্যকার কৌমার্য ঘুচিয়ে মুণ্ডারীদের পত্তন আবাদ করেছিল সেই কবে। কবে তাদের নামে এই বাঘ-বরা-ভালুক অধ্যুষিত শাল-গজার-পলাশ-কুসুম-পিয়াল-পিয়াসাল-সিধা-শিবম্ গাছের জঙ্গল আর কিশোরী ধরিত্রীর উদ্বেল কুসুমিত বুকের মতো নাতিউষ্ণ পাহাড় দিয়ে ঢাকা যে অপরূপ দেশ, তার নাম দিয়েছিল ছোটনাগপুর।
> ছোটনাগপুর যাদের নামে, তাদের বংশের মানুষ হয়ে আমি — সুগানা মুণ্ডাটা, ভিখারির অধম, পেটে ঘাটো থাকে না, পরনে কাপড় কষে বাঁধলে ছিঁড়ে। (মহাশ্বেতা, ২০০৩ : ৯৭)

জঙ্গল কেটে আবাস গড়েছিল মুন্ডারা — কিন্তু সে বাসভূমের রাজা হল অন্যজাতের, অন্য দেশের মানুষ। তারা মুন্ডাদের উচ্ছেদ করে জমি-জিরাত দখল করে নিল এবং মুন্ডাদের পরিণত করল ক্রীতদাসে। বীরসা মন্ডা এ শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুন্ডাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। 'উলগুলান' বা বীরসা-বিদ্রোহের মূলমন্ত্রই ছিল মুন্ডারীরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩.১

বাংলাসাহিত্যের বৃত্তে আদিম জনগোষ্ঠী নিয়ে রচিত উপন্যাস দুর্লভ নয়। বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-সতীনাথ ভাদুড়ির সাহিত্যধারায় আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে। *পূর্বপার্বতী* ও *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসদ্বয়ের সংগ্রামী চেতনা এসেছে ভিন্নরূপে — তারা অভাব-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয় বরং নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় স্বাধিকার আন্দোলনে সামিল হয়েছে। উভয় উপন্যাসে বিষয়-অন্তর্বয়নে ভিন্নতা থাকলেও গঠন-শৈলীতে দ্রোহের চেতনা স্ফুরিত হয়েছে লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে — আর এ দিক থেকেই উপন্যাসদ্বয় অনন্য হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

টীকা

১. '*পূর্বপার্বতী* জাতিতত্ত্বের গবেষণা নয়; নাগাদের কাম-লালসা-হিংসা, ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং জীবনের দ্রুত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস।' (লেখকের কথা, প্রফুল্ল, ২০০২ : ১৯)

২. রানি গাইডিলিও ব্রিটিশ-বিরোধী একজন যোদ্ধা। ১৯১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি মণিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মণিপুর ও নাগা পাহাড় থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্য তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে যদোনাঙের অধীনে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ শুরু করেন এবং ১৬ বছর বয়সে গেরিলা বাহিনীর নেত্রী হয়ে ওঠেন। সে সময়েই ১৯৩২ সালের ১৭ অক্টোবর ব্রিটিশ আর্মি কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে তিনি কারামুক্ত হন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজ জাতির জন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯৯৩ সালে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

৩. ১৮৯৯-১৯০০ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহ বিশেষত, সৈলরাকাব পাহাড়ে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের সঙ্গে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ঘটনা সমকালীন পত্রিকায় (দিস্টেট্‌স্‌ম্যান, দি বেঙ্গলি) প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিদ্রোহের নানা বিবরণ পাওয়া গেছে। ঔপন্যাসিক নিজে অবলম্বন করেছেন সুরেশ সিং-এর *Dust and Storm and Hanging Mist* গ্রন্থটি। এছাড়া সুপ্রকাশ রায়ের *মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক*, গোপীনাথ সেনের *স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা*, ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শঙ্করানন্দ দাস সম্পাদিত *পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন* প্রভৃতি গ্রন্থে বীরসার উলগুলানের বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রফুল্ল রায়, ২০০২। *রচনাসমগ্র ১*, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩। *রচনাসমগ্র ৮*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শরৎচন্দ্র রায়, ২০০৫। 'মুণ্ডা জাতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।

সুপ্রকাশ রায়, ২০০১। *মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক*, ৪র্থ সং, রেডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা।

সুবোধ দেবসেন, ২০১০। *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।